প্রথম আলো | তারিখ AUG 17 2006 | পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৩

বেসরকারি শিক্ষক_ধর্মঘট

শেষ হইয়াও হইল না শেষ

শরিফুজ্জামান পিন্টু

এক মাস ধর্মঘটের পর মেনে নেওয়া হয়েছে বেসরকারি
দের মূল দাবি। তবে শিক্ষার্থীদের বেতন সরকারি
গারে জমা দেওয়ার শর্ত সৃষ্টি করেছে নতুন সংকট।
র-সমর্থক শিক্ষক সংগঠনগুলো বেতন বাড়ার ঘোষণা
র পর ধর্মঘট প্রত্যাহার করেছে। কিন্তু সরকারবিরোধী
নগুলো বেতন বাড়ানোর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া শর্ত প্রত্যাহার
য়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

মার্থিক সংকটের কথা উল্লেখ করে জোট সরকার নগদ
ভাগ এবং বাকিতে (বন্ড হিসাবে) পাঁচ ভাগ বেতন
নার ঘোষণা দেয়। সরকার যদি এ সিদ্ধান্ত শুরুতেই নিত
ল বছরের মধ্য ভাগে, পড়াশোনার ভরা মৌসুমে
পড়ার ক্ষতি এতটা হতো না। তবে চাপের মুখে দাবি
কৌশল অবলম্বন করায় তা সরকারের জন্য বুমেরাং
হ। শিক্ষকদের মূল দাবি মানা হলো, আবার আন্দোলনও
গেল। বিষয়টি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শেষ হইয়াও
না শেষ' পঙ্‌ক্তির মর্মার্থ প্রকাশ করে।

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে আসন্ন নির্বাচন
ক্ষে সরকার বেসরকারি শিক্ষকদের বেতন বাড়াতে বাধ্য
হ। সাড়ে চার বছর ধরে শিক্ষক সংগঠনগুলো সরকারকে
বাড়ানোর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে
ন। এরপর প্রকাশ্যে প্রধানমন্ত্রীকে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী
ব আখ্যা দেওয়া হয়। নির্বাচন সামনে আসায় বেসরকারি
করা জোট সরকারকে অনেকটা জিম্মি করে ফেলেন।

০ শতাংশ বেতন বাড়াতে সরকারের খরচ হবে ২৫৮
টাকা। কিন্তু দেশের প্রায় ৩০ হাজার বেসরকারি স্কুল,
, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত
ত্রীদের বেতন সরকারি কোষাগারে নেওয়ার ব্যবস্থা
পারলে সরকার কয়েক শ কোটি টাকা পাবে। সরকারের
হচ্ছে, বেসরকারি শিক্ষকদের ১০ শতাংশ মূল বেতন
থীর টিউশন ফি থেকে পাওয়ার কথা। সেই ১০ শতাংশ
র দিলে শিক্ষার্থীর বেতনও সরকারের কোষাগারে জমা
হবে।

ক্তি হিসেবে এটা মন্দ নয়। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, সরকার
ভাগ মূল বেতন দেওয়ার পরও একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের
খরচ থাকে। সচ্ছল প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত শিক্ষক নেয়,
ও প্রশাসনিক কাজে বিভিন্ন খরচ করে। নামীদামি কিছু
ান ১০ ভাগ বেতন দেওয়ার পরও সামর্থ্য অনুযায়ী বাড়ি
চিকিৎসা ভাতা বা উৎসব ভাতা দেয়। তবে এ ধরনের
ানের সংখ্যা দেশে পাঁচ থেকে সাত শতাংশের বেশি নয়।
র অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই শিক্ষার্থীর বেতন বা প্রতিষ্ঠানের
, বাগান বা অন্যান্য সামান্য আয় থেকে জোড়াতালি দিয়ে

যবশ্য সরকার বলছে, শিক্ষার্থীর বেতন সরকারি
গারে নেওয়ার আগে নীতিমালা করা হবে। সরকারের
ন মেয়াদে এটা যে সম্ভব নয়, তা অনেকটা নিশ্চিত। কিন্তু
সেখানে একইসঙ্গে শিক্ষার্থীর বেতন সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়ার ঘোষণায় তা ঝুলে রইল।

সাবেক শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেকও আন্দোলনরত শিক্ষকদের দাবি মানার প্রশ্নে এমন শর্ত দিয়েছিলেন। আওয়ামী লীগ সরকার ৪৯ দিন ধর্মঘটের পর বেসরকারি শিক্ষকদের ১০ শতাংশ বেতন বাড়িয়েছিল। তখনো সামনে জাতীয় নির্বাচন থাকায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আয় সরকারি কোষাগারে দেওয়ার বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হলেও সিদ্ধান্ত হয়নি।

বেসরকারি শিক্ষকেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আয় সরকারের কোষাগারে জমা দিতে চান, তবে তাদের পাল্টা শর্ত হচ্ছে, চাকরি জাতীয়করণ করতে হবে। অর্থাৎ সরকারি শিক্ষকদের মতো তারা বাড়ি ভাড়া, চিকিৎসা ভাতা, বার্ষিক প্রবৃদ্ধিসহ অন্যান্য সুবিধা চান। পাঁচ লক্ষাধিক বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীর চাকরি জাতীয়করণ যে সম্ভব নয়, এটা সরকার যেমন জানে, শিক্ষক নেতারাও বিষয়টি বোঝেন।

বেসরকারি পরিচয়ে এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ কতটা যৌক্তিক তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। পর্যাপ্ত যোগ্যতা না থাকলেও অনিয়ম, দুর্নীতি এবং রাজনৈতিক পরিচয়ে বেশির ভাগ শিক্ষক নিয়োগ পেয়েছেন। তারা শিক্ষার বিকাশে বা জাতি গঠনে কতটা ভূমিকা রাখছে সেটি অবশ্যই বিবেচনা করা উচিত। এর পাশাপাশি শিক্ষকতা পেশায় যেসব মেধাবী এসেছে তাদের জন্য যোগ্যতার ভিত্তিতে বিশেষ কিছু করা এবং মেধাবীরা যাতে এ পেশায় আকৃষ্ট হয় সে জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখা উচিত। যোগ্য-অযোগ্য এবং প্রথম শ্রেণী-তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে যদি বেতনের ভেদাভেদ না থাকে তাহলে এ পেশার প্রতি মেধাবীরা আকৃষ্ট হবে না।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হিসাবে, বেসরকারি শিক্ষকদের সব দাবি পূরণ তথা চাকরি জাতীয়করণ করতে অতিরিক্ত প্রয়োজন দুই হাজার ২৩৮ কোটি টাকা। বর্তমানে ২ হাজার ৯০০ কোটি টাকা বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা খাতে খরচ হচ্ছে। সব দাবি মেনে নিলে প্রয়োজন হবে পাঁচ হাজার ১৩৮ কোটি টাকা। অথচ চলতি অর্থবছরে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে মোট ১১ হাজার ৯৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

শিক্ষা বাজেটের মধ্যে আবার রয়েছে প্রযুক্তি খাত। গোটা শিক্ষা প্রশাসন, অবকাঠামো ও সংস্কার, সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা, ক্যাডেট শিক্ষাসহ সবকিছু সামলাতে এমনিতেই শিক্ষা বাজেটের টানাপোড়েন অবস্থা। তারপর রয়েছে বহুমাত্রিক দুর্নীতি, সিংহ ভাগ প্রকল্পের ব্যর্থতা ও অপচয়। দৃশ্যত শিক্ষা বাজেটের সিংহ ভাগ অর্থ খরচ হচ্ছে বেতন-ভাতা এবং উন্নয়ন খাতে। সর্বোচ্চ বরাদ্দের শিক্ষায় দুর্নীতি যেমন সর্বাধিক, তেমনি সুফলও কম।

এ প্রসঙ্গে প্রায় ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে একমুখী শিক্ষা চালুসহ মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। দাতাদের ঋণ এবং সরকারের টাকায় নেওয়া এ প্রকল্পের টাকা থুবড়ে পড়েছে। তবে শিক্ষার নীতিনির্ধারক পর্যায়ের দায়ী কর্মকর্তারা এই অপচয় ও ব্যর্থতার জন্য পুরস্কার হিসেবে পেয়েছেন পদোন্নতি বা চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার প্রথমদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক জরিপে বলা হয়েছিল, দেশে ১০ সহস্রাধিক নিম্নমানের বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা রয়েছে। সরকারের শেষদিকেও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ১০ সদস্যের একটি কমিটির তদন্তে দেখা গেছে, প্রায় সাত হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অপ্রয়োজনীয় জনবল রয়েছে, শিক্ষার্থী পর্যাপ্ত নয়, লেখাপড়ার পরিবেশ নেই। প্রশ্ন হচ্ছে, এসব প্রতিষ্ঠানও কি রাষ্ট্র ও জনগণের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে হবে?

নব্বই-পরবর্তী সব সরকার একদিকে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে বেসরকারি স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসা গড়ার ঢালাও অনুমতি দিয়েছে, অন্যদিকে শিক্ষা প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট কিছু কর্মকর্তা এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে শেষ জীবনে কোটিপতি হয়েছেন।

মা-বাবা অথবা নিজের নামে যেসব অপ্রয়োজনীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হয়েছে, ডোনেশন দিয়ে যারা শিক্ষক হয়েছেন, তৃতীয় বিভাগ নিয়ে যারা শিক্ষকতায় এসেছেন, চাকরি না পেয়ে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে যারা অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ বা শিক্ষক হয়েছেন তাদের সরকার যে সহযোগিতা দিচ্ছে তাই তো ঢের বেশি। এ ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষককে জাতীয়করণ করা হলে কোচিং সেন্টার, গৃহশিক্ষক, বিদেশ ছাত্র পাঠানোর নামে প্রতারণায় জড়িত বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানকে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা দিতে কারও বোধহয় আপত্তি থাকবে না।

সেই পাকিস্তান আমল থেকে আজও শিক্ষা বিভাগ 'ভ্যাকেশন ডিপার্টমেন্ট' হিসেবে পরিচিত হয়ে আসছে। প্রতিবছর অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হরতাল, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, পাবলিক পরীক্ষা, নিয়োগ পরীক্ষাসহ বিভিন্ন কারণে ৭০ থেকে ৭৫ দিন অনির্ধারিত বন্ধ থাকে। এ ছাড়া নির্ধারিত সরকারি ছুটি রয়েছে আরও ৮৫ দিন। এর বাইরে রয়েছে ৫২ দিন সাপ্তাহিক ছুটি। তা ছাড়া বই জোগাড় ও ভর্তি হতে জানুয়ারি চলে যায়, ডিসেম্বর জুড়ে চলে পরীক্ষা ও ফল প্রকাশের তোড়জোড়। আগামী সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে রোজা, এরপর রয়েছে ঈদ ও দুর্গাপূজার আনন্দ।

গত পাঁচ সপ্তাহে অধিকাংশ বেসরকারি স্কুল-কলেজে লেখাপড়া হয়নি। নির্বাচনের বছর রাজনৈতিক অঙ্গন উত্তপ্ত হবে এবং লেখাপড়ায় বিঘ্ন ঘটবে। শিক্ষক নেতারা বলেছেন, ধর্মঘটের ক্ষতি অতিরিক্ত ক্লাস নিয়ে পুষিয়ে দেওয়া হবে। শিক্ষামন্ত্রীও আশা করছেন, শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীর ক্ষতি পূরণে উদ্যোগী ও আন্তরিক হবেন। বাস্তবে তা কতটুকু সম্ভব, তা বোধহয় কারও অজানা নয়। দেশের প্রায় এক কোটি শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন এ বছর শেষ হবে জোড়াতালি দিয়ে। তাই সময়ক্ষেপণ না করে শিক্ষকদের শ্রেণীকক্ষে ফিরিয়ে নিন, শিক্ষকেরাও শিক্ষার স্বার্থে শ্রেণীকক্ষে ফিরে যান।